কেমন বিশ্ববিদ্যালয় চাই

০৬ মে ২০১৯, ১২:১৯
আপডেট: ০৬ মে ২০১৯, ১২:২৩

গত ১১ থেকে ১২ এপ্রিল তারিখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কেমন বিশ্ববিদ্যালয় চাই: উচ্চশিক্ষা, নীতিমালা, কাঠামো’ শিরোনামে দুই দিনব্যাপী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক আয়োজিত ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এই শিক্ষক-কনভেনশনে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার নানান সংকট, সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা হয় এবং কিছু সমাধান প্রস্তাব করা হয়। এখানে তা প্রকাশ করা হলো।

বাংলাদেশে একসময় বিশ্ববিদ্যালয় বলতেই ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশনির্ভর স্বায়ত্তশাসিত চারটি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবা হতো। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি এর প্রকৃতিও বিচিত্র হয়েছে। প্রায় ৪০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে প্রায় ১০০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে, তেমনি পুরোনো স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে ১৯৭৩ অধ্যাদেশের বাইরের সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যেও রয়েছে প্রকৃতিগত পার্থক্য। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক মানের অবনমন ঘটেছে বলে একটি ধারণা ধীরে ধীরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় দলীয় রাজনীতি শিক্ষাগত মানের ওপর প্রভুত্ব করছে। অল্প কয়েকটি বাদ দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু সনদ বিক্রির ভবনে পরিণত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কনভেনশনের আয়োজন করে শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

সংকটগুলো চিহ্নিত, যেমন:

১. সরকারি কর্তৃত্ব: সরকারি কর্তৃত্ব দলীয় রাজনীতিবাহিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন হরণ করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ওপর দলীয় রাজনীতির চর্চা প্রভুত্ব করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে পদ-সম্পদ-প্রমোশন বাঁটোয়ারার নীতি শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিমুখী করে তোলে।

২. নয়া উদারবাদী নীতি ও ইউজিসির কৌশলপত্র: বিশ্বব্যাংকের মতো বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান নয়া উদারবাদের নীতি অবলম্বনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে, মানোন্নয়নের নাম দিয়ে সর্বজনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বেসরকারীকরণের উপাদান প্রবিষ্ট করছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২০ বছর মেয়াদি (২০০৬-২০২৬) কৌশলপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি করতে ও সরকারি বরাদ্দ কমাতে নীতিগত চাপ প্রয়োগ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এখন সান্ধ্য কোর্স, বৈকালিক কোর্স, ছুটির দিনে বিশেষ প্রোগ্রাম চলছে। এই মুক্তবাজার আবহাওয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়ার সুযোগ ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে।

৩. স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার: পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণে আনতে নানান উদ্যোগ নিয়েছিল। তার বিপরীতে ৭৩-এর আদেশ একটি অর্জন হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু অধ্যাদেশটি শতবর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় কোন স্থানে পৌঁছাবে, তার দিকনির্দেশনা দেয়নি। অন্যদিকে, শিক্ষকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হলেও মূলত দলীয় রাজনীতিপ্রধান হয়ে উঠেছে এবং সরকারদলীয় শিক্ষকনেতাদের দাপট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে পড়েছে নির্বাচনকেন্দ্রিক, ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে বছরজুড়ে শিক্ষকদের নানান নির্বাচন হয়ে থাকে। অথচ জবাবদিহির অভাবে পাঠদানে শিক্ষকেরা অবহেলা করে থাকেন, স্বায়ত্তশাসনের সুযোগকে এ ক্ষেত্রে যুক্তি হিসেবে হাজির করা হয়। এ ছাড়া অধ্যাদেশটি শিক্ষকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও দিকনির্দেশনা দেয় না। সরকারি আধিপত্য কমানো আর গণতান্ত্রিক ও জ্ঞানমুখী পরিবেশ নিশ্চিত করতে স্বায়ত্তশাসনের সংস্কার প্রয়োজন।

৪. শিক্ষায় বরাদ্দ ও গবেষণা: জিডিপি বা বাজেটের বিপরীতে শিক্ষায় বরাদ্দের হারে দক্ষিণ এশীয় মানের তুলনায়ও বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। একদিকে গবেষণার তহবিলের বরাদ্দ নেই, অন্যদিকে হীন দলীয়

রাজনীতি গবেষণামনস্ক শিক্ষকদের জন্য নানান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, যে ক্ষেত্রে গবেষণাবিমুখ ও রাজনীতিপ্রবণ শিক্ষকদের জন্য রয়েছে বহাল তবিয়তে থাকার নানান উপায়। আবার শিক্ষার্থীদের পিএইচডি-এমফিল গবেষণার জন্য নেই সুষ্ঠু পরিকাঠামো। এ দেশের গবেষকেরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশেই গিয়ে থাকেন, দেশের পিএইচডির মানও নেই, মূল্যও নেই।

৫. অস্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়: অস্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে নানান ধরন। যেমন: প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, সেনা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পরিস্থিতি বেশ শোচনীয়। সব ক্ষমতা উপাচার্যের কাছে কেন্দ্রীভূত এবং সেই উপাচার্য যেহেতু দলীয় আনুগত্যে মনোনীত হন, তাই শিক্ষকদের স্বাভাবিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন আইন দিয়ে চলছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিষয় কেবল সাধারণ–গণতান্ত্রিক উপাদানের ঘাটতি এবং কেন্দ্রীভূত প্রশাসনব্যবস্থা।

৬. নিয়োগ ও ভর্তি: শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ভালো ফলের শিক্ষার্থীই গুরুত্ব পাওয়ার কথা। কিন্তু তাঁদের বাদ দিয়ে দলীয় বিবেচনায় 'ভোটার' নিয়োগের প্রবণতা দিন দিনই বাড়ছে। অন্যদিকে, এমসিকিউনির্ভর ভর্তিপ্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্থীদের সব সময় পাওয়া যায় না। শ্রেণিকক্ষের গড় মান এভাবে পড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ধরনও বিভিন্ন। ভর্তি পরীক্ষা থেকে শিক্ষকদের উপার্জন বাড়ে, কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভোগান্তিও পাল্লা দিয়ে বাড়ে।

৭. শিক্ষার্থীদের আবাসন ও ছাত্ররাজনীতি: কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আবাসনসংকটের সুযোগে গড়ে উঠেছে গণরুমপ্রবণতা, গেস্টরুম সংস্কৃতি ও সাধারণ ছাত্রদের ওপর সরকারি ছাত্রসংগঠনের নিয়ন্ত্রণমূলক রেজিমেন্টেশন। ছাত্রাবাসগুলোয় বসবাসের ও অধ্যয়নের ন্যূনতম পরিবেশ নেই। বরং নিবর্তন ও মাস্তানির সূত্রে রয়েছে এক ভীতিকর পরিবেশ, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলনীতির পরিপন্থী এবং শিক্ষার্থীদের উদার ও মুক্তচিন্তা বিকশিত হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ। সরকারি ছাড়া বাকি সংগঠনকে এক নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশের মধ্যে রাজনীতি করতে হচ্ছে।

৮. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমরূপ বা হোমোজেনাস নয়। তাদের মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। অল্প কয়েকটির মান যথেষ্ট উন্নত (যদিও সেখানে টিউশন ফি অত্যন্ত উচ্চ), বেশির ভাগের মান বেশ নিম্ন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত মুনাফামুখী, সে তুলনায় মান অর্জনে আগ্রহ কম। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গবেষণার পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। তাদের এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়ার অনুমতি নেই।

সমাধান প্রস্তাব

১. রাষ্ট্রের হাতে যে সমাধান: বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটগুলো রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকটগুলোর সমাধান হওয়া দরকার। সরকারগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বাস করে না, নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। আজকের জন্য এমন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় চাই, যা চিন্তার স্বাধীনতা, প্রশ্ন করার পরিসর এবং বিশ্লেষণের বিস্তার নিয়ে তৈরি হবে। সরকারকে এ ক্ষেত্রে উদার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের মতো চলতে দিতে হবে। উন্নয়নের ধারায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শিক্ষা খাতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নশীল দশা থেকে উন্নত দশায় উন্নীত হওয়ার পেছনে শিক্ষা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের ভূমিকা রয়েছে।

২. **ইউজিসির কৌশলপত্র ও নয়া উদারবাদী নীতি:** নব্য উদারবাদী মতাদর্শের আলোকে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বব্যাংক–প্রণীত বাণিজ্যিকীকরণের নীতি থেকে সরে আসতে হবে। উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চশিক্ষাকে দরিদ্র মানুষের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। নৈশ বা সান্ধ্য কোর্সগুলো ধীরে ধীরে তুলে নিতে হবে। বছর বছর ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাড়ানো বন্ধ করতে হবে।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার আইন ও নীতি: তিয়াত্তরের আদেশের অপব্যবহার রোধে কিছু সংস্কার প্রয়োজন। সিন্ডিকেটে নির্বাচিত ছয়জনের বাইরে যেসব শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেপুটেশনে বাইরে গিয়েছেন, তাঁদের আবার সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সিন্ডিকেটে মনোনয়ন দেওয়া বন্ধ করতে হবে। সিনেট নির্বাচনে নির্বাচিত ৩৫ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাইরে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের নির্বাচনে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোনো শিক্ষক নির্বাচন করতে পারবেন না। যাঁরা প্রশাসনের নানান পদে রয়েছেন, তাঁদের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তিয়াত্তরের আদেশের আওতামুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য তিয়াত্তরের আদেশের আদর্শের আলোকে আইন ও নীতি চূড়ান্ত করতে হবে। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় স্থানীয় প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সব ক্ষমতা উপাচার্যের হাতে না রেখে কিছুটা ক্ষমতা বিভাজন করতে হবে।

৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সমধর্মী ভাবা বন্ধ করতে হবে, কারণ এগুলো হোমোজেনাস না। ভালো, দক্ষ, বয়স্ক শিক্ষকদের ধরে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার, পূর্ণকালীন শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য দূর করা জরুরি। শিক্ষকদের অধিকার নিয়ে কথা বলার জায়গা দরকার। মালিকদের একচেটিয়া ক্ষমতার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রের মনোযোগ দরকার। পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রি করানোর অনুমতি দেওয়া দরকার। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজেদের গ্র্যাজুয়েটদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে পাবলিক-প্রাইভেটের একটা

যোগসূত্র করা দরকার, শিক্ষার্থীরা যেন পাবলিক-প্রাইভেটে আদান-প্রদান করতে পারেন। বাংলায় পাঠদানের ক্ষেত্রে হীনম্মন্যতাবোধ থেকে মুক্তি দরকার।

৫. পাঠদান ও গবেষণা: পাঠদানের মতো ন্যূনতম কাজটিতে শিক্ষকদের জবাবদিহির পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। শিক্ষকদের কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করতে হবে। পাঠদান শিক্ষকের প্রথম কাজ, দ্বিতীয় কাজ গবেষণা। ভালো শিক্ষক ভালো গবেষক নাও হতে পারেন, উল্টোটাও ঘটতে পারে। তাই শিক্ষকের আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী লোড বণ্টনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে এবং তাঁদের স্বীকৃতি ও প্রমোশন সেই আলোকে হতে পারে। গবেষণার জন্য সরকারকে প্রচুর বরাদ্দ দিতে হবে। গবেষণার অনুদান প্রাপ্তিতে দলগত পরিচয়ের প্রাধান্য বন্ধ করতে হবে। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণায় চৌর্যবৃত্তি ধরার সফটওয়্যার সব বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে হবে। দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ফান্ডসমেত সার্বক্ষণিক পিএইচডি-এমফিল ডিগ্রি চালু করতে হবে।

৬. ভর্তি, নিয়োগ ও প্রশাসন: ভর্তি পরীক্ষাপদ্ধতি ধাপে ধাপে পরিবর্তন করতে হবে। প্রশ্নের ধরন পাল্টাতে হবে আগে, সম্পূর্ণ এমসিকিউভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা থেকে সরে এসে অ্যাপটিচ্যুড টেস্টে যেতে হবে। প্রথম বর্ষে সবাইকে হলে সিট দিয়ে দিতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে ওপরের দিকে মেধা ও চাহিদার ভিত্তিতে সিট বণ্টন হতে পারে। শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের প্রথম পর্যায় প্রভাষক পদে নিয়োগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে এ বিষয়ে নিয়োগপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। দলগত ও আঞ্চলিক বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিভাগে পাস করা শিক্ষার্থীদের ওই বিভাগে চাকরি দেওয়ার প্রবণতা বদলাতে হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

১. ইউজিসির চলমান কৌশলপত্রের বিপরীতে পাল্টা কৌশলপত্র প্রণয়ন।

২. তিয়াত্তরের আদেশের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে তার আলোকে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ও জ্ঞানমুখী পরিচালনা নীতিমালা প্রবর্তন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করা।

‘বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্র’ শীর্ষক উদ্বোধনী অধিবেশন ছাড়া অন্য যেসব বিষয়ে অধিবেশন ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে ছিল ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন: কৌশলপত্র’, ‘১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন’, ‘পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে: প্রাইভেট ও “সরকারি” বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতা’, ‘নিউলিবারেল রূপান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়’, ‘পাঠদান ও গবেষণা’ এবং ‘ভর্তি, নিয়োগ ও প্রশাসন’।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের পক্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক আনু মোহাম্মদ, নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সাঈদ ফেরদৌস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক রুশাদ ফরিদী, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক কাজী মারুফুল ইসলাম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক গীতি আরা নাসরীন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের তানজীম উদ্দিন খান।